Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-IV, July 2020, Page No. 43-50
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভাষার পারিভাষিকতা : একটা দার্শনিক অনুসন্ধান

অতনু সাহা
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

In this short discourse I have tried to focus on three main themes, one: nature of language and linguistic form, two: the interrelation between the language, culture and civilisation and the three: use of some terms like, astika, nastika, sabdartha sambandha in Indian Philosophy which denote some extra features other than ordinary sense. By this three important themes I have tried to show that how the language develops culture and civilisation, and apart from this it has also been highlighted in this short discourse that how the language united different community by the virtue of multidimensional power of language. In this research article I have also tried my best to unfold the philosophical analysis towards the literature and Art in the light of Indian and western aesthetics.

সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবনব রূপে পৃথিবীর বুকে প্রতিভাত হয় এবং তা অতীতকে সঙ্গী করে বর্তমানকে উপস্থাপিত করে। বলা যেতে পারে মানব জাতির সঙ্গে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক তদাত্ম্য। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছত্রছায়া ব্যতিরেকে মানবজাতির অস্তিত্ব কল্পনা প্রায় অসম্ভব। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে অন্যতম প্রধান তিনটি উপাদান হল ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। সভ্যতার কাঁধে ভর করে সংস্কৃতি ভবিষ্যতের অভিমুখে ক্রমধাবমান। আবার অন্যদিকে সংস্কৃতিই সভ্যতাকে বিবর্তনের পথ ধরে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। অনেকটা 'দ্বি-চক্র যান' এর মত। সামনের চাকাটি পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ঠিকই কিন্তু তাকে এগিয়ে যেতে শক্তি যোগায় পিছনের চাকাটি। সামনের চাকাটিকে সভ্যতা রূপে কল্পনা করলে পিছনের চাকাটিকে সংস্কৃতি হিসাবে ধরা যেতে পারে। আর এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর ভর করে এগিয়ে চলে আরোহী মানবজাতি।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে এই সমগ্র বিষয়টিকে অর্থাৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে, বহন করে এবং সমসাময়িক করে গড়ে তোলে ভাষা। সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে সুদীর্ঘ ইতিহাস সেদিকে লক্ষ্য রেখে বলা যেতে পারে ভাষা ছাড়া সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে ওঠা ও টিকে থাকা সম্ভব নয়। এই সমগ্র বিষয়টির যদি একটা ক্রম কল্পনা করা যায় তাহলে বিষয়টি দাঁড়ায় অনেকটা এরকম- ভাষার উপর ভর করে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি অর্থাৎ যে সমস্ত সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি প্রত্যেকটিকে দৃঢ় ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে ভাষা। আর এই সংস্কৃতিই সভ্যতা কে বলবান করে তোলে। সুতরাং সমস্ত কিছুর ভিত্তি হল ভাষা। ভাষা কিভাবে সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে, কিভাবেই বা সংস্কৃতি

উপাদানগুলি ভাষার উপর নির্ভরশীল হয় এই জিজ্ঞাসাগুলি এই প্রবন্ধের মূখ্য উপজীব্য বিষয়, এছাড়াও প্রসঙ্গক্রমে ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়কে আরও যে জিজ্ঞাসাগুলি আমাদের কে ভাবিত করে সেই ভাবনার একটা সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হবে। তবে প্রবন্ধের কলেবরের সীমাবদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রেখে সংস্কৃতির সমস্ত উপাদানের উপর আলোকপাত করা এখানে সম্ভব হবে না, কারণ সংস্কৃতি ও তার উপাদান বিষয়ক আলোচনা ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। তাই সংস্কৃতি অন্যতম মূল উপাদান সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন এর সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক কতটা নিবিড় সে বিষয়ে আলোচনা এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণও কাজকর্মের ক্ষেত্রে ভাষা একটি অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম, বাস্তব অভিজ্ঞতার আদান প্রদান ভাষার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় সামাজিক সংজ্ঞাপনের একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম, যাকে ব্যতিরেকে সুস্থ স্বাভাবিক একটি মুহূর্তও ভাবা যায় না। সভ্যতা সৃষ্টির সূচনালগ্নে একটা সময় ছিল যখন মানুষ হয়ত আকার- ইঙ্গিতে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতো, যার একটা ভাষা ছিল। কিন্তু যখন থেকে মানুষ সভ্যতার অভিমুখে পা বাড়িয়েছে তখন থেকেই মানুষ মনের ভাব প্রকাশের তাগিদে সৃষ্টি করেছে নতুন নতুন ভাষা, যা কিনা পরিবর্তনশীল। পৃথিবীতে যেমন রয়েছে অসংখ্য জাতিগোষ্ঠী তেমনই রয়েছে বহুবিধ ভাষা এবং প্রত্যেক ভাষার রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা ও ঐতিহ্য। একটি জাতি বা গোষ্ঠী কতটা সমৃদ্ধ তা অনেকাংশেই নির্ভর করে তার ভাষাগত ঐতিহ্যের ওপর। আরণ্যক মানব নিজের প্রয়োজনে সংগঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে বিবর্তনের চাকায় ভর করে সৃষ্টি হয় গোষ্ঠী ও সমাজ। যে সমস্ত উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করে মানুষ গোষ্ঠী ও সমাজে একত্রিত হয়েছিল ভাষা তার মধ্যে অন্যতম। যে প্রাচীন সভ্যতাগুলির নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায় সেখানে ভাষাও লিপির প্রাধান্য চোখে পড়ার মতো। ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির মধ্যেও লিপি বা লেখমালা একটি প্রধান উপকরণ। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাড়াচাড়া করলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য- গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- আর্য ভাষাগোষ্ঠী দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী, অস্ট্রিক (Austric) ভাষাগোষ্ঠী, ভোট-ব্রহ্ম (Tibeto-Burman) ভাষাগোষ্ঠী ইত্যাদি।[১]

মানব জীবনে সমাজের গুরুত্ব বা প্রভাব বিচার করতে গিয়ে অনেক সময়ই একতরফা হিসাব করা হয়ে থাকে। মানব মনের উপর সমাজের ক্রিয়া বিবেচনা করা হয়, কিন্তু আরো একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপারের দিকে নজর দেওয়া হয় না, সেটা হল ভাষা। ভাষা যেমন সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয় যার প্রভাব সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, আবার তেমনি ভাষা সমাজকে পরিবর্তিতও করে। আর এই মিথস্ক্রিয়া দ্বারা নির্ণিত হয় ইতিহাসের গতি। সেই সুপ্রাচীনকাল থাকেই ভাষা মানব জাতিকে নিরন্তর একত্রিত করে চলেছে। সমকালীন পরিস্থিতিতেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এখনও রুজি- রুটির তাগিদে যুথবদ্ধ মানুষের যখন কোনো নতুন বসতি স্থাপন করে অর্থাৎ কোনো কলোনী, কোনো পাড়া বা কোনো পল্লী গড়ে ওঠে তার মূলে থাকে ভাষা, শুধু তাই নয় বিভিন্ন ভাষাকেন্দ্রিক জনজাতিগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানও প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। ফলত ভাষার মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পরে, যা কালক্রমে ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করে, সেই সঙ্গে জীবনযাত্রাকেও করে তোলে সহজ ও গতিময়।

ভাষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক। মানবজাতিকে সংস্কৃতি সম্পন্ন করে তুলতে ভাষার ভূমিকা অপরিসীম। অন্যভাবে বলা যেতে পারে ভাষাই মানুষকে সাংস্কৃতিক করে তোলে। সংস্কৃতি মূলত মানব জাতির সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ। সুবিশাল পরিধি বিশিষ্ট এই সংস্কৃতির এককথায় বা একবাক্যে

ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায়, মানুষের জীবন চর্চা ও চর্যার বৈচিত্র্যময় সমন্বিত রূপই হচ্ছে সংস্কৃতি। সমাজে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাপনের ধরন, ঐতিহ্য, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, চিন্তন, নৈতিক মূল্যবোধ- এই সবের মিলিত রূপকে সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। সংস্কৃতি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ চাহিদার বাহ্যিক নজির। সংস্কৃতির পরিচালক শিল্পমূল্য, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদি অর্থাৎ মানসিকও নৈতিক উপার্জন সমূহ। সংস্কৃতি বিষয়ক উন্নতি মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। আর এই মানসিক ক্ষমতার বিকাশে আশৈশব সহায়তা করে চলে ভাষা। সংস্কৃতিকে দ্বিবিধ ভাবে অর্থাৎ বাস্তব এবং মানসিক দিক দিয়ে বিবেচনা করা চলে। এহেন বিচারে সংস্কৃতি দ্বিবিধ। যথা—

১) বাস্তব সংস্কৃতি
২) মানসিক সংস্কৃতি

বাস্তব সংস্কৃতি পুরাতত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান এর আলোচ্য। মানসিক সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান। মানসিক সংস্কৃতির নিদর্শন হচ্ছে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, চিত্রকলা ইত্যাদি। মানসিক সংস্কৃতির মূল ভিত্তিতে বিরাজমান বাস্তব সংস্কৃতি। বাস্তব সংস্কৃতির তাৎপর্য জীবন ধারণের সব রকম অর্থাৎ উপাদানগত, বৃত্তিগত, প্রযুক্তি সংক্রান্ত উপকরণ সমষ্টি। বাস্তব সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক সংস্কৃতিকে, তবে এই নিয়ন্ত্রণ ঠিক কারণের দ্বারা কার্য সংঘটনের অনুরূপ নয়। বাস্তব ও মানসিক উভয়বিধ সংস্কৃতির বিকাশকে সাহায্য করে দেশীয় জনশ্রুতি এবং বাহ্যপ্রভাব। উভয় প্রকার সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে জীবন ধারণের প্রয়োজন থেকে। ঐহিকতা ও পরলোক প্রীতির পিছনেও থাকে জীবন যাপনের সমস্যাগুলি। সামজিক অবিচার ও জীবনের বিড়ম্বনাগুলিকে সহনীয় করে তোলে ধর্মীয় বিশ্বাস ও পরলোক বিশ্বাস। তাই বাস্তব ও মানসিক উভয়িবিধ সংস্কৃতির একটি বিশেষ পর্যায়কে সভ্যতারূপে অভিহিত করা যায়।

মানব জীবনের মূল্যবোধ ও তার বহিঃপ্রকাশই হল সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির উপাদান হল জীবন, জীবনানুভূতি ও জীবন দর্শন। আরো একটু সরলীকরণ করলে বলা যেতে পারে, যে বস্তুটিকে সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয় তা গঠিত হয় মূলত কয়েকটি উপাদান দ্বারা। সেগুলি-

১) মূল্যবোধ: মূল্যবোধ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় মানুষের পার্থিব জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা। জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত ধারণা বা বিশ্বাস, যা জীবনকে একটি নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে।

২) জীবন দর্শন: সাধারণ মানুষ অধিকাংশ সময়ই ঠিক করতে পারে না যে তাঁদের জীবনের চরম লক্ষ্য কি। এই চরম লক্ষ্য বিষয়ে সম্যক ধারণাই হল জীবন দর্শন। জীবন আসলে কি, জীবনের অর্থ কি ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বুঝতে সহায়তা করে জীবন দর্শন।

৩) শিক্ষা ও চিন্তন: শিক্ষা বলতে বুনিয়াদী শিক্ষাকে বোঝানো হয়েছে। শিক্ষা মানুষের জীবনে আচরণগত পরিবর্তন সাধন করে। আর তার ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে চিন্তা ধারাতেও পরিবর্তন আসে। তাই যেকোনও মানুষের ন্যুনতম শিক্ষার প্রযোজন।

৪) নৈতিকতা: নৈতিকতা হল জীবন কে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার পন্থা বিশেষ, যা ব্যাক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপলব্ধি করে। এই প্রশিক্ষণ সবসময় যে প্রথাগত হবে এমন নয়, এই প্রশিক্ষণ পারিবারিক, সামাজিক বা লৌকিক ও হয়ে থাকে।

৫) সমাজ দর্শন: সমাজ ব্যাবস্থা বিষয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই এক কথায় সমাজ দর্শন বলা যেতে পারে। সমাজবদ্ধ মানুষের যে পারস্পরিক সম্পর্ক সেই সম্পর্কগুলোকে মূল্যায়িত করতে শেখায় সমাজ দর্শন।

যে ভাষায় সাহিত্য রচনা হয়, সেই ভাষাই শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আবার দর্শনের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে একই ভাষার প্রয়োগ হলেও সবসময় একই অর্থ বহন বা প্রকাশ করে না। তবে এ জন্য ঐ সমস্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণকে যে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এমন নয়, বরং এর ফলে ভাষার বোধ আরও পরিস্কার ও স্বচ্ছ হয় বলে মনে হয়। এরকম না হয়ে যদি এমন হত যে শুধুমাত্র সংস্কৃতি, শুধুমাত্র শিল্প, শুধুমাত্র দর্শন ইত্যাদির জন্য পৃথক পৃথক ভাষা বরাদ্দ, তাহলে হয়ত মানুষের মনের যে ভাব ও আবেগ এবং তার সঙ্গে যে যুক্তিবোধ বা রসবোধ তার গতি বিঘ্নিত হতে পারত, পাশাপাশি এগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও সমস্যা বহুল হয়ে উঠত। ফলত সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ইত্যাদির সম্মিলিত রূপ হিসাবে সংস্কৃতি নামক যে বিষয়টি জনসমক্ষে প্রকট হয় তাও বাধাপ্রাপ্ত হত।

সাহিত্য মূলত রস প্রধান। সাহিত্যের মূলে বিরাজ করে রস। যে রসের ভাব বা স্বাদ পাঠক সেই সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে লাভ করে। এই রসের আস্বাদনই সাহিত্যকে একটা উচ্চ মার্গে পৌঁছে দেয়। পাঠক হয়ে ওঠে রসিক। সাহিত্য চর্চা করার সময় পাঠকের তন্ময় হয়ে পরার পিছনে রয়ে যায় সাহিত্যের রস ও পাঠকের রসগ্রহিতা। একটা বই-এ ব্যবহৃত বিপুল শব্দরাশি বা বাক্যরাজি পাঠকের অজান্তেই কোন এক সময় কাব্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কাব্যে ব্যবহৃত এই বিপুল শব্দরাশি বা বাক্য সম্ভার আদতে একটা ভাষার আকার মাত্র। ভাষার এই আকার সাহিত্যের প্রকাশক। সাহিত্যে ভাষার এই আকারের অন্তরালে রসের যে চোরাস্রোত বয়ে যায়, যেখানে পাঠক ডুব দিয়ে এক অভিনব আহ্লাদাত্মক অনুভূতি উপলব্ধি করে, সেটায় সাহিত্যের প্রকৃত ভাষা। সাহিত্যের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যসমূহের প্রেক্ষিতে একটা আক্ষরিক অর্থ অবশ্যই থাকে, কিন্তু পাঠক যখন এই আক্ষরিক অর্থের সীমানা অতিক্রম করে তার অতিরিক্ত কোনও অর্থ অনুধাবন পূর্বক রসাস্বাদন করে কোন নির্দিষ্ট কাব্য বা উপন্যাস-এ বারবার হারিয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে তখন এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ব্যবহৃত ঐ সমস্ত বাক্যগুলির যে আক্ষরিক অর্থ তার থেকে পাঠকের দ্বারা লব্ধ অনুভূতি অনেকটায় উন্নতমানের। ঠিক এই অবস্থায় পাঠকের চেতনার অগোচরেই বাক্যসমূহ কাব্যে উন্নীত হয়। ভাষা যদি শুধুমাত্র আক্ষরিক ভাবেই অর্থ বহন ও প্রকাশ করত তাহলে এটা সম্ভব হত না। তাই বলা চলে ভাষা এখানে একদিকে উপায় বা পথ আবার অন্য দিকে লক্ষ্য।

সাহিত্যের ভাষা আক্ষরিক অর্থের পাশাপাশি অতিরিক্ত এক বিশেষ প্রকারের রস সৃষ্টি করে। এই রসের জন্য পাঠক কোনও বিশেষ, নির্দিষ্ট সাহিত্য চর্চায় রত থাকে। পাঠক ওই সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এই হারিয়ে যাওয়া কিন্তু ভাষার কতকগুলি শব্দের বা বাক্যের মুখ্য অর্থে হারিয়ে যাওয়া কিন্তু ভাষার কতকগুলি শব্দের বা বাক্যের মুখ্য অর্থে হারিয়ে যাওয়া নয়। বরং তার থেকে অতিরিক্ত কিছু খুঁজে পাওয়ার আগ্রহে হারিয়ে যাওয়া। পাঠক শব্দ এবং অর্থের বাইরে তৃতীয় উপাদান হিসাবে নতুন কিছু একটা খুঁজে পায়, যেটাকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে রস বলা হয়। এই রসের স্বাদ পাঠক বারবার পেতে চায়। বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব মানুষের এটা স্বাভাব, এটাই তার বৈশিষ্ট্য। যেটা সে জানে তাকে অতিক্রম করে নতুন কিছু জানতে চায়। আর এখান থেকেই মানুষের মনে বিশেষ কিছু প্রশ্ন উঁকি দিতে থাকে, যে প্রশ্নগুলি তাকে ভাবতে শেখায়। অথবা কোন একটি চিরাচরিত বিষয়কে নতুন আঙ্গিকে দেখতে শেখায়। আর এই জিজ্ঞাসা থেকেই শুরু হয় দর্শন। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এরকম কেন? অথবা বিষয়টি কিভাবে হয়? কোথাও কোথাও এই

প্রশ্নগুলি মানুষকে নতুন পথের নির্দেশ করে পদ্ধতির দিক থেকে আরার কখনও সে উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে এই কেন-র মধ্যে থেকে। এই ধারাবাহিক প্রবাহমানতায় প্রমাণ করে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যগুলি শুধুমাত্র কিছু আক্ষরিক অর্থকে বহন করে না বরং তার থেকে অতিরিক্ত নতুন কিছু বহন করে, সেটাকে খুঁজে বের করে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করাই হল সাহিত্যের কাজ না সাহিত্যিকের কাজ। আবার সমান্তরাল ভাবে এগুলির মধ্যে থেকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে পাঠকের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়াই হল দর্শনের কাজ।

সাহিত্যে আত্মিক প্রকাশ ঘটে শব্দ বা কথামালার মাধ্যমে। আপন অন্তরের অনুভূতিগুলিকে কবি-সাহিত্যিকগণ বৈশ্বিক (universal) রূপে সকলের সামনে উপস্থাপিত করেন এবং এই ভাবেই সামান্য মানবের কাছে ব্যাক্তি মানবকে সঁপে দিয়ে উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন।[২]

সাহিত্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে কবি সাহিত্যিকের অবদান অনস্বীকার্য। সাহিত্য শিল্পেরই অপর একটা দিক। তাই কবি-সাহিত্যিকগণকে কথাশিল্পী বললে অত্যুক্তি হবে না। কেননা ভাবের প্রকাশ, রসের সঞ্চার এবং ছন্দময় কথার সুনির্বাচিত সমাবেশে সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। ঠিক যেভাবে একটা সঙ্গীত, একটা চিত্র বা একটা ভাস্কর্য সৃষ্টি হয়। আর এই সৃষ্টিতেই স্রষ্টার স্বাক্ষর। ভাব প্রকাশ সার্থক হলে অর্থাৎ স্রষ্টা যেটা বলতে চায় সৃষ্টির মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে তাহলেই শিল্পে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। কথাশিল্পীগণ তো কথা, শব্দের মাধ্যমে খুব সহজে না হলেও ভাবের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। অবশ্যই সেক্ষেত্রে প্রধান ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ভাষা। কিন্তু একজন ভাস্কর বা চিত্রকর যে শিল্প সৃষ্টি করে তার ভাষা কি? আদৌ কি কোনও ভাষা সেখানে বর্তমান থাকে? যদি না থাকে তাহলে সেই সৃষ্ট শিল্পটি মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায় কিভাবে? একটা ভাস্কর্য বা মূর্তি বা চিত্র দেখে কিভাবে মানুষ বলে ওঠে 'বাঃ আসাধারণ'? শিল্পের ভাষা বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে এই প্রশ্নগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে পরে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন একই ভাষার প্রয়োগ ঘটলেও তার অর্থ ও বোধে সময় বিশেষে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, শিল্পের ক্ষেত্রেও সেকরম পরিস্থিতি চোখে পরে।

সুদীর্ঘ ইতিহাসকে অতিক্রম করে ভাষা যেমন আজকের রূপ অবস্থান করছে, শিল্পেরও ততধিক প্রাচীন একটা ইতিহাস রয়েছে। মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে বাঁচতে বন জঙ্গলে বাস ছেড়ে গুহায় আশ্রয় নিল তারপর মানুষের সৃজনশীল মন তার অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করল নিরেট রুক্ষ পাথরের গায়ে। রক্ষণোপায় ব্যবস্থার অঙ্গ গুহাগাত্রে প্রকট হল শিল্পকর্ম, যা দীর্ঘ সময় অতিক্রম করার পর পরিচিতি পেল গুহাচিত্র রূপে। এই গুহাচিত্রগুলি প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পকর্ম। তাই বলা যেতে পারে মানব জাতির ইতিহাস সংরক্ষণের পূর্বেই শুরু হয়েছিল তার শিল্পকর্ম। এই শিল্প-ই ছিল তখনকার যোগাযোগের ভাষা। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য গুহাচিত্রের ব্যবহার ইতিহাসে লক্ষ করা যায়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ অতিক্রম করে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করে অদম্য অপরাজেয় মানুষ তার জয়যাত্রার অভিযানে সব বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে মহৎ মর্যাদা অর্জনের আশায়।[৩] সেই অভিযোজিত মানুষ আজ উত্তরাধুনিক যুগের বাসিন্দা। সময়ের সাথে সাথে অভিযোজিত শিল্পও তার রূপ বদলেছে। শিল্পী শিল্পের মাধ্যমে মনের ভাবগুলিকে প্রকাশ করে, যে ভাবগুলি শিল্পী প্রকাশ করে তা তার ব্যক্তিগত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে যেন সার্বিক হয়ে ওঠে। কারণ অখণ্ড, সামান্য ভাবগুলিই শিল্পীর ব্যঞ্জনার বিষয়, ঠিক যেমন সাতটি সুরকে নিয়ে যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ সঙ্গীত সৃষ্টি হয়ে চলেছে। কতকগুলি সর্বজনীন ভাবের উপর

শিল্পের সার্বিক আবেদন নির্ভর করে, কিন্তু তার জন্য প্রকাশ প্রণালীকেও সকলের বুঝার উপযুক্ত করা দরকা।[৪] যেমন- ছবি আঁকার ক্ষেত্রে একটা 'রেল লাইন' আঁকার সময় যে রেখার ব্যবহার করা হয় একটা 'নদী' আঁকার সময় কিন্তু একই রেখা ব্যবহার করা হয় না। তাই শিল্পীর একটা রেখাও কখনও কখনও ভাষা হয়ে ফুটে ওঠে জনমানসে।

ভাব ও ভাবনা পরিবর্তিত হলে বা পৃথক হলে তার প্রকাশক ভাষাও পৃথক হয়। ভাবের ও ভাবনার বিষয় আলাদা হলে ভাষার রীতি নীতি, আকৃতি প্রকৃতি আলাদা হয়। দার্শনিক বিষয়; শৈল্পিক বিষয়, সামাজিক বিষয়, নৈতিক বিষয়, লৌকিক বিষয় প্রভৃতি পৃথক পৃথক বিষয় ভাষার বিষয় হয়। ভাব প্রকাশের জন্য বক্তা এবং ভাব গ্রহণের জন্য শ্রোতা উভয়েই শব্দকে আশ্রয় করে ভাব বিনিময় করে থাকেন। এই বিনিময় সার্থক শব্দের মাধ্যমেই সংঘটিত হয় বলে শব্দিকগণের প্রবৃত্তি কেবল সার্থক শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।[৫] দার্শনিক বিষয়ে ভাব প্রকাশের ভাষা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। বিচার্য্য বিষয় সূক্ষ্ম গভীর হলে ভাষার কলেবরও সেরূপ হয়। এই জন্য সকল ক্ষেত্রে অভিধানে অভিহিত শব্দের দ্বারা এই ভাষার কলেবর সংঘটিত হওয়া সম্ভব হয় না। ভাব ও ভাবনা পৃথক হয়ে থাকে বলেই হয়তো যে ভাষা সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সেই ভাষা দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। ভাষা আক্ষরিক ভাবে বা প্রতীকগত ভাবে একই থাকে কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ অর্থগুলো নতুন রূপ নেয়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা দর্শনে পরিভাষার রূপ নেয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে যে পরিভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না এমন নয়, তবে এখানে আলোচ্য বিষয় হলো সাধারণ ভাষা বা শব্দগুলি দর্শনে কিভাবে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পরিভাষা বলতে সহজে ভাবে বলা যেতে পারে একটি শব্দ যা বিশেষ প্রসঙ্গে বিশেষ অর্থ অভিব্যক্ত করে। এক কথায় বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দ।[৬] ভাষায় ব্যবহৃত কোনো শব্দ অনন্তকাল ধরে সমানভাবে একই অর্থ ব্যবহৃত হবে এমন নয়। এই পরিভাষার মাধ্যমে অর্থটা কোথাও কোথাও একটা যেন নতুন রূপ লাভ করে, যেমন দর্শন। দর্শনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনও একটা ভাষায় ব্যবহৃত কোনো একটা শব্দ পরিভাষার মাধ্যমে অন্য একটা নামে প্রকাশিত হয়। পরিভাষা বাস্তবিক পক্ষে কোনও একটা ভাষায় ব্যবহৃত অন্য নাম। অর্থাৎ ভাষার কোনও একটি নির্দিষ্ট শব্দ সাধারণভাবে জনমানসে যেভাবে ব্যবহৃত হয়, সেই একই নির্দিষ্ট শব্দ সাধারণভাবে জনমানসে যেভাবে ব্যবহৃত হয়, সেই একই শব্দ দর্শনে সেভাবে ব্যবহৃত না হয়ে ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদি শুধুমাত্র নিত্য ব্যবহৃত ভাষার উপরে ভর করে চলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে দর্শনের হয়ত বিশেষ কিছু এসে যায় না। কিন্তু একটি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলি পরিভাষাগত দিক দিয়ে কিভাবে ব্যবহৃত হয় তার একটা রূপরেখা দেওয়া যেতে পারে।

কার্যত ভাষা এবং পরিভাষার মধ্যে যে বন্ধন সেটা দর্শনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আলোচনা ও ব্যাখ্যার সুবিধার্থে আস্তিক-নাস্তিক, শব্দার্থ সমন্ধরূপে বৃত্তি, নৈতিকতা ইত্যাদি শব্দগুলিকে উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে।

বাংলায় বহুল প্রচলিত শব্দগুলির মধ্যে অন্যতম হলো 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক'। 'আস্তিক' শব্দটির প্রচলিত অর্থ হল 'যে বা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী'। আর 'নাস্তিক' শব্দটির প্রচলিত অর্থ হলো 'যে বা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না'। কিন্তু এই শব্দগুলি যখন দর্শন শাস্ত্রে ব্যবহার করা হয় তখন এগুলির অভ্যন্তরীণ অর্থ-এর রূপ পরিবর্তিত হয়। দর্শনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে আস্তিক শব্দটিক অর্থ হলো 'যে দর্শন সম্প্রদায় বেদ-এ বিশ্বাসী', আর নাস্তিক শব্দটির অর্থ হলো 'যে সম্প্রদায় বেদ-এ বিশ্বাসী ন্য'। যদিও এক্ষেত্রে যেগুলি আস্তিক দর্শন বলে

বিবেচিত হয় তাদের মধ্যে ঈশ্বার তত্ব স্বীকৃত হয়েছে এমন দর্শন সম্প্রদায় যেমন আছে পাশাপাশি ঈশ্বর তত্ত্ব স্বীকৃত হয়নি সেরকম দর্শন সম্প্রদায় ও রয়েছে।[৭] যেমন যোগ দর্শনে ঈশ্বর তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে এবং এই দর্শন সম্প্রদায় আস্তিক বলে বিবেচিত এটা সর্বজন বিদিত ঠিক তেমনই সাংখ্য দর্শন, মীমাংসা দর্শন ও আস্তিক দর্শন রূপে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তারা ঈশ্বর তত্ত্ব স্বীকার করেনি। তাই আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঈশ্বর তত্ত্বের স্বীকৃতি এবং অস্বীকৃতি উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। আস্তিকতা বিষয়ে জনমানসে প্রচলিত যে ধারণা সেটা যে একবারে ভেঙ্গে যাচ্ছে বা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন নয়, বরং ঈশ্বর কেন্দ্রিক আস্তিকতার যে ধারণা সেটা পরিবর্তিত হচ্ছে পরিভাষার হাত ধরে। প্রচলিত সাধারণ অর্থের ক্ষেত্রে আস্তিকতার কেন্দ্র ছিল 'ঈশ্বর' আর পরিভাষার কেন্দ্রে রয়েছে 'বেদ'। ভারতীয় সমাজের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাধারণ ভাবে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে বেদের মাধ্যমে আবার সেই বেদ-ই আস্তিক ষড়দর্শনে ঈশ্বর প্রতিম অবস্থান করছে অর্থাৎ সাধারণ জনমানসে ঈশ্বরের যে স্থান, যে মূল্য; দর্শনের ক্ষেত্রে বেদের স্থান বা মূল্য ঠিক তেমনই।

ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হ্যেছে যে কোনও একটি ভাষায় ব্যাবহৃত একটি শব্দ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ার মানে হল ওই ভাষায় ব্যাবহৃত শব্দটি একটি অন্য নামে পরিচিত হওয়া। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে- শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ কে সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে 'শব্দার্থ সম্বন্ধ'। যে কোনও সাধারণ মানুষই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে এই নামেই জানে বা ব্যাবহার করে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের আঙ্গিকে যখন দেখা হয় তখন ওই শব্দটির অর্থ পরিবর্তন না করে একটি নতুন নাম-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, সেটি হল ' বৃত্তি'।

দর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল নীতিবিদ্যা বা নীতিশাস্ত্র। দর্শনের জ্ঞান চর্চা কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই শাখাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই নীতিবিদ্যায় বহুল চর্চিত বিষয় হল 'নৈতিকতা' শব্দটি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে ব্যাবহৃত হয় সেখানে 'সদাচার সম্পন্নতা'কে নৈতিকতার জ্ঞাপক বলা যেতে পারে।[৮] চৌর্যবৃত্তিকে সেখানে অত্যন্ত নিচ চোখে দেখা হয়। অথচ নীতিবিদ্যায় এই চৌর্যবৃত্তিকেও নৈতিকতার মধ্যে অন্তর্গত করা হয়। কারণ এখানে নৈতিকতা শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যাবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ পরিভাষাটি পরিবর্তিত হচ্ছে। নীতিবিদ্যায় নৈতিকতা বলতে 'ভাল' এবং 'মন্দ' উভয়কেই বোঝানো হয়ে থাকে। এককম বহু শব্দই আছে যেগুলি বিশিষ্টার্থ বোধক বা পারিভাটিক অর্থে ব্যাবহৃত হয়। তাই বলা যেতে পারে যে ভাষার অন্তর্গত শব্দ ও তার অর্থ চিরন্তন ও সর্বজনীন নয়। এগুলি সময়ের চাহিদা ও ক্ষেত্রে বিশেষে পরিবর্তিত হয় ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রকাশক হয়।

তথ্যসূত্র:

১। বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি (প্রথম ভাগ), নৃপেন্দ্র গোস্বামী, পৃষ্ঠা ১২১
২। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, শিল্প, সৌন্দর্যদর্শন, প্রবাসজীবন চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২২১
৩। সভ্যতার সংকট, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা ১৫
৪। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, শিল্প, সৌন্দর্যদর্শ্ন, প্রবাসজীবন চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২২৯
৫। শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, গঙ্গাধর করা, পৃষ্ঠা ১৫৫
৬। এক্ষণ (শারদীয় সংখ্যা ১৩৯৬), বাংলা পরিভাষা, আশোক মুখোপাধ্যায় , পৃষ্ঠা ১০৫
৭। ভারতীয় দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, পৃষ্ঠা ১৩
৮। নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা, সোমনাথ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৭-৮

গ্রন্থপঞ্জি:

১। কর, গঙ্গাধর, শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৩।
২। গোস্বামী, নৃপেন্দ্র, বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি (প্রথম ভাগ), নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৯৫।
৩। চক্রবর্তী, সোমনাথ, নীতিবিধ্যার তত্ত্বকথা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৮।
৪। দাস, করুণাসিন্ধু, প্রাচীন ভারতের ভাশাদর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২।
৫। দাস, করুণাসিন্ধু, শব্দতত্ত্ব, সদেশ, কলকাতা, ২০০৮।
৬। মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮।
৭। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, দর্শন, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ২০১৫।
৮। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, শিল্প, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ২০১৫।
৯। ভট্টাচার্য, অমিত, ন্যায়বৈশেষিকের ভাষা, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতাআ, ২০০৩।
১০। মুখোপাধ্যায়, আশোক, বাংলা পরিভাষা কিছু জিজ্ঞাসা, এক্ষণ শারদীয় সংখ্যা, নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত সুবর্ণরেখা, কলকাতা ১৩৯৫।
১১। নন্দী, সুধীর কুমার, নন্দনতত্ত্ব, পসচিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৩।
১২। হালদার, গুরুপদ, ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৬।